ঝড়-বৃষ্টির কথা*

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

গোড়াতেই কয়েকটি কথা বলে নেওয়া ভাল। বিজ্ঞানের তরফ থেকে আলোচনা করা এ স্থলে সম্ভবপর নয়। বিজ্ঞানের হিসাব নিক্তি-ওজনে, সমস্ত কথা চুল-চিরিয়া বলা দরকার—তা'তে বোঝবার অসুবিধা হয়। তাই এই প্রবন্ধে অনেক কথা খুব মোটামুটি ভাবে বল্‌ব—বিজ্ঞানের হিসাবে ছোট খাট ভুল থেকে যাবে, কিন্তু উপায় নেই। ব্যতিক্রমের কথাও বাদ দিতে হ'বে, সাধারণ ভাবে যা সত্য শুধু তার কথাই বলব।

ঝড় বৃষ্টি সকল দেশে সমান রকম নয়। এই প্রবন্ধে আমরা বাংলাদেশের কথাই আলোচনা করব—বিশেষতঃ দক্ষিণ বাংলার কথা। তবে সাধারণভাবে এর অনেক কথা বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম সম্বন্ধেও খাটে—কিছু কম বা কিছু বেশি।

বাংলাদেশে সারা বছরে যে বৃষ্টি পড়ে মোটামুটি ভাবে তাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) গ্রীষ্মকালের বৃষ্টি—কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে; চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে।

(২) বর্ষা কালের বৃষ্টি—আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে।

---

*শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ব্যাখ্যান হইতে শ্রীসত্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত ও শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত।

(৩) ঘূর্ণি-ঝড়ের বৃষ্টি—ইংরাজিতে যাকে cyclone বলে তার সঙ্গে : চৈত্র থেকে আশ্বিন পর্যান্ত প্রায় সব সময়ে হতে পারে।

(৪) শীত কালের বৃষ্টি : কার্ত্তিক থেকে ফাল্গুন পর্যান্ত।*

বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা শুধু গ্রীষ্মকালের বৃষ্টি আর কালবৈশাখী ঝড়ের কথাই আলোচনা করব।

কালবৈশাখীর পরিচয়

বাংলাদেশে সকলেই কালবৈশাখী ঝড়কে জানে। ছোট একখণ্ড মেঘ দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আরম্ভ হয় ; তারপর প্রায়ই মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে' আবার অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যায়। কালবৈশাখীর মেঘে বিদ্যুতের খেলা আর বাজ পড়া দুই খুব বেশি দেখা যায়; বর্ষা বা শীতকালের মেঘে ততটা নয়।

কালবৈশাখী মেঘের একটা বিশেষ চেহারা আছে, খুব ফুলো ফুলো প্রকাণ্ড মেঘ ; রবীন্দ্রনাথের একখানা চিঠিতে তার চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়।

২রা জুন, ১৮৯২—

"কাল বিকেলের দিকে এমনি করে এল আমার ভয় হল। এমনতর রাগী চেহারার মেঘ কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। গাঢ় নীল মেঘ দিগন্তের কাছে একেবারে থাকে থাকে ফুলে উঠেছে, একটা প্রকাণ্ড হিংস্র দৈত্যের রোষস্ফীত গোঁফজোড়াটার মত। এই ঘন নীলের ঠিক পাশেই দিগন্তের সব শেষে ছিন্ন মেঘের ভিতর থেকে একটা টকটকে রক্তবর্ণ আভা বেরচ্চে—একটা আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড অলৌকিক "বাইসন" মোষ যেন ক্ষেপে উঠে, রাঙা চোখ দুটো পাকিয়ে ঘাড়ের নীল কেশরগুলো ফুলিয়ে মাথাটা নীচু করে দাঁড়িয়েছে—এখনি পৃথিবীকে শৃঙ্গাঘাত করতে আরম্ভ করে দেবে।"

মেঘ ক'রে আসার সঙ্গে সঙ্গে খুব জোরে বাতাস বইতে থাকে, আর ঝড় আরম্ভ হয়। কালবৈশাখীর এটা একটা বিশেষ লক্ষণ ; খুব বড় বড় cyclone ছাড়া এমন ঝড় অন্য সময় প্রায় দেখা যায় না। ১৯শে জুন, ১৮৯১ তারিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানা চিঠিতে আছে :—

"কাল পনেরো মিনিট বাইরে বসতে না বসতে পশ্চিমে ভয়ানক মেঘ করে এল, খুব কালো, গাঢ় আলুথালু রকম মেঘ, তারি মাঝে মাঝে চোরা আলো প'ড়ে রাঙা হয়ে উঠেছে।......যারা মাঠে শস্য কাটতে এসেছিল তারা মাথায় এক বোঝা শস্য নিয়ে বাড়ীর দিকে ছুটে চলেছে, গরুও ছুটেছে, তার পিছনে পিছনে বাছুর লেজ নেড়ে নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়বার চেষ্টা করচে। খানিক বাদে একটা আক্রোশের গর্জ্জন শোনা গেল ;

* এখানে সময় শুধু খুব মোটামুটি ভাবে বলা হয়েছে, আর প্রতি বৎসরই নানারকম ব্যতিক্রম দেখা যায়।

কতকগুলো ছিন্ন ভিন্ন মেঘ ভগ্নদূতের মত সুদূর পশ্চিম থেকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এল—তারপর বিদ্যুৎ, বজ্র, ঝড়, বৃষ্টি সমস্ত একসঙ্গে এসে প'ড়ে খুব একটা তুর্কি নাচন নাচ্‌তে আরম্ভ করে দিলে—বাঁশগাছগুলো হাউ হাউ শব্দে একবার পূর্ব্বে একবার পশ্চিমে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগ্‌লো—ঝড় যেন সোঁ সোঁ করে সাপুড়ের মত বাঁশি বাজাতে লাগ্‌ল আর জলের ঢেউগুলো তিন লক্ষ সাপের মত ফণা তুলে তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করে দিলে। কালকের সে যে কি কাণ্ড সে আর কি বল্‌ব। বজ্রের যে শব্দ সে আর থামে না—আকাশের কোন্‌খানে যেন একটা আস্ত জগৎ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্চে। বোটের খোলা জানালার উপর মুখ রেখে প্রকৃতির সেই রুদ্রতাপে আমিও বসে বসে মনটাকে দোলা দিচ্ছিলুম।"

অনেক সময় প্রথমে খুব খানিকটা ধুলো ওড়ে। এই হিসাবে উত্তরপশ্চিম ভারতবর্ষে গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে যে "আঁধি" দেখা দেয় তার সঙ্গে কাল-বৈশাখীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথের আরেকখানা চিঠিতে (৯ই জৈষ্ঠ, ১৮৯২) তার পরিচয় পাওয়া যায়।

"কাল যে ঝড় সে আর কি বলব!..... ধুলোয় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং বাগানের যত শুক্‌নো পাতা একত্র হয়ে লাটিমের মত বাগানময় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল—যেন অরণ্যের যত প্রেতাত্মাগুলো হঠাৎ জেগে উঠে 'ভূতুড়ে' নাচন নাচ্‌তে আরম্ভ করে দিলে। বাগানের সমস্ত গাছপালা পায়ে শিক্‌লি বাঁধা প্রকাণ্ড জটায়ুপাখীর মত ডানা আছড়ে ঝট্‌পট্‌ ঝট্‌পট্‌ করতে লাগ্‌ল। সে কি গর্জ্জন, কি মাতামাতি, কি লুটোলুটি ব্যাপার!"

কোন কোন সময় এই রকম ঝড় হয়েই সব থেমে যায়; বৃষ্টি আর পড়ে না। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে খুব জোরে এক পশ্‌লা বৃষ্টি আসে; প্রথমে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ও আসে—তারপর কখনো কখনো ঝড় কমে গিয়ে আরও খানিকটা বৃষ্টি হয়ে যায়। কালবৈশাখী বৃষ্টির ফোঁটাগুলি খুব বড় বড় হয়, আর খুব ঠাণ্ডা; অনেক সময় শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে।

কালবৈশাখী ঝড় হঠাৎ আসে, আর তার সূচনা হয় প্রায়ই উত্তর পশ্চিম দিক থেকে, তাই এর ইংরাজী নাম "nor'westers"এর বেশ সার্থকতা আছে।

রবীন্দ্রনাথের আরেকখানা চিঠি থেকে একটা পুরো ঝড়ের কথা তুলে' দিয়ে আমরা কালবৈশাখীর বর্ণনা শেষ করব।

"তখন সূর্য্য অস্ত গেছে কিন্তু অন্ধকার হয় নি। একেবারে দিগন্তের প্রান্তে যেখানে গাছের সার নীলবর্ণ হয়ে দেখা যাচ্ছে, তারি উপরেই ঠিক একটি রেখামাত্র খুব গাঢ় নীল মেঘ উঠে খুব চমৎকার দেখতে হয়েছে।.....বাঁধের ধারে একসার তালবন এবং তালবনের কাছে একটা মেঠো ঝরণার মত আছে—সেইটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছি এমন সময়ে দেখি উত্তরে সেই নীলমেঘ অত্যন্ত প্রগাঢ় এবং স্ফীত হয়ে চলে আস্‌চে এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্দন্ত বিকাশ কর্‌চে।.....বাড়িমুখে যেমন ফিরেচি অম্‌নি প্রকাণ্ড

মাঠের উপর দীর্ঘ পদক্ষেপ করতে করতে সরোসগর্জ্জনে একটা ঝড় আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ল।...ধূলোয় এম্‌নি অন্ধকার হয়ে এল যে পাঁচ হাত দূরে কিছু দেখা যায় না। বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগ্‌ল—কাঁকরগুলো বায়ুতাড়িত হয়ে ছিটে-গুলির মত আমাদের বিঁধতে লাগ্‌ল—মনে হল বাতাস পিছন থেকে ঘাড়ে ধরে আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্চে—ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পিট্ পিট্ করে মুখের উপর সবেগে আঘাত করতে লাগ্‌ল।"

কালবৈশাখীর সময়

মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে গ্রীষ্মকালই কালবৈশাখীর সময়। বর্ষার মাঝামাঝি আর শীতকালে কালবৈশাখী প্রায়ই হয় না; "পচা ভাদ্রে" মাঝে মাঝে হয়ে থাকে।

রৌদ্রের তাপ যখন প্রখর হয়ে ওঠে আর জল থেকে বাষ্প টেনে নিয়ে বাতাস যখন ভিজে যায় তখনই কাল-বৈশাখীর সময় আসে। হাওয়া আপিসে নানা জায়গা থেকে যে দিন খবর আসে যে দিনরাত দুই গরম হয়ে উঠেছে আর বাতাস খুব ভিজে, তখন বোঝা যায় যে এইবার কালবৈশাখীর সময় এল।

Alipore Observatoryর নানা রকম যন্ত্রচিত্রে প্রায় প্রত্যেক বছরই অনেকগুলি কাল-বৈশাখীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। সুবিধামত সে সব ইতিহাস পরে আলোচনা করা যাবে; এখানে মোটামুটি কয়েকটা খবর দেব।

নীচের তালিকায় গত ১০ বৎসরের মধ্যে Alipore Observatoryর উপর দিয়ে কতগুলি কালবৈশাখী ঝড় হয়ে গেছে তা পাওয়া যাবে। এছাড়াও ছোট ছোট ঝড় বৃষ্টি হয়েছে—কিন্তু এইগুলিই বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

কালবৈশাখীর সংখ্যা

খৃষ্টাব্দ	মার্চ্চ	এপ্রিল	মে	জুন	সর্ব্বসমেত
১৯১৫	৭	৫	৬	৭	২৫
১৯১৬	০	৪	৩	১	১২
১৯১৭	১	২	৩	১	১১
১৯১৮	২	৫	৪	২	১৩
১৯১৯	২	১১	২	১	১৬
১৯২০	৩	২	৩	০	৮
১৯২১	০	৯	৩	১	১৩
১৯২২	১	১	১	০	১৩

খৃষ্টাব্দ	মার্চ্চ	এপ্রিল	মে	জুন	সর্ব্বসমেত
১৯২৩	১	২	৯	৩	১৩
১৯২৪	০	৬	৫	৩	১৪
দশবৎসরের সর্ব্বসমেত	১৭	৫১	৪২	২১	১২১
গড়ে বৎসরে	১·৭	৫·১	৪·২	২·১	১২·১

দেখা যাচ্ছে যে কলিকাতার কাছাকাছি জায়গায় প্রতিবছর 'গড়ে' ১২টি কালবৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে। তার মধ্যে এপ্রিল আর মে মাসেই সব চেয়ে বেশি।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে যখন তাপ আর বাষ্প জমে ওঠে তখন একটা কিছু তোলপাড় না হয়ে নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গায়, ঠিক কোন্ সময়টিতে ঝড় আসবে তা' বলা যায় না। বাটিতে দুধ গরম করবার সময় দেখা যায় যে এমন একটা অবস্থা আসে যখন, থেকে থেকে হঠাৎ এক একটা "বল্‌কা" ফুটে উঠতে থাকে। বাতাসে তাপ যখন জমে ওঠে তখনও কতকটা সেইরকম থেকে থেকে এক একটা ঝড় ফুটে উঠ্‌তে থাকে।

এই জন্যই প্রায় দেখা যায় যে সারাদিন অসহ্য গরমের পরে বিকাল বেলা কিংবা সন্ধ্যার সময় ঝড় আসে। রাত্রে কিংবা ভোরবেলা কালবৈশাখী প্রায় হয় না। *

কালবৈশাখীর লক্ষণ

ঝড়, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি এই তিন নিয়ে কালবৈশাখী। এ সম্বন্ধে আগামীবারে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা কর্‌ব; এখানে মাত্র কয়েকটা লক্ষণের কথা বলে নি।

কালবৈশাখী হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়। তাই বাংলাদেশে আকস্মিক বিপদের সঙ্গে কালবৈশাখীর নাম জড়িত। বাংলাদেশের মাঝিমাল্লারা জানে যে কালবৈশাখী কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার—তাই তাদের গানে আছে "ঐ ঈশান কোণে মেঘ উঠেছে, ডিঙা বেঁধে থো"। নদীর উপর কালবৈশাখীকে ভয় না করে এমন লোক বাংলাদেশে নাই।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঝড় এসে পড়ে; অনেক সময় আধ ঘণ্টা আগেও কিছু টের পাওয়া যায় না। Alipore Observatoryর যন্ত্র-লিপিতে সব আগে খবর পৌঁছয়, কিন্তু তাও খুব বেশিক্ষণ আগে নয়। এ সম্বন্ধে কালবৈশাখীর প্রকৃতি ঘূর্ণি-ঝড়ের (cyclone) সম্পূর্ণ উল্‌টা; ঘূর্ণি-ঝড়ের খবর দুতিন দিন আগে, অনেক সময় চার পাঁচ দিন আগেও, পাওয়া যায়।

* এ কথা আবার সমুদ্র সম্বন্ধে খাটে না। সেখানে আবার উল্‌টা নিয়ম। রাত্রে আর ভোর বেলাতেই সমুদ্রের উপর কালবৈশাখী ঝড় বেশী হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, সমুদ্রের উপর এরকম ঝড় শীত কালেই বেশী হয়, গ্রীষ্মকালে নয়। কালবৈশাখীর জন্মের কথা আলোচনা করবার সময় এর কারণ বোঝা যাবে।

ঝড়ের খবর সব আগে ধরা পড়ে barometer, বা বাতাসের চাপ মাপবার, যন্ত্রে। কাল-বৈশাখী আরম্ভ হবার ঘণ্টাখানেক আগে, কখনো কখনো দুই তিন ঘণ্টা আগে, barometer একটু "পড়তে" থাকে (অর্থাৎ বাতাসের চাপ একটু হাল্কা হয়)—কিন্তু খুবই সামান্য পরিমাণে, এত কম যে অনেক সময় পরিষ্কার কিছু বোঝা যায় না। বিজ্ঞানের ভাষায় এই "পড়ার" পরিমাণ অনেক সময় ০.০৫০" ইঞ্চির (অর্থাৎ এক ইঞ্চির ১০০ ভাগের ৫ ভাগের) বেশি হয় না। ঝড় আরম্ভ হলেই কিন্তু barometer খুব তাড়াতাড়ি "উঠ্‌তে" থাকে—সময় সময় কয়েক মিনিটের মধ্যে ০.২৫০" (অর্থাৎ প্রায় সিকি ইঞ্চি) উঠে গেল এমনও দেখা যায়। এটা হল কালবৈশাখীর একটা বড় লক্ষণ। ঘূর্ণি-ঝড়ে এরকম কখনো হতে পারে না—ঝড়ের কেন্দ্রস্থলে barometer খুব নীচু থাকবেই এবং ঝড়ের মাঝে barometer কখনো উঠ্‌বেই না। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ৫ই অক্টোবরের cycloneএ কলকাতায় barometer ১.১৬", প্রায় সওয়া ইঞ্চি, পড়ে গিয়েছিল। কালবৈশাখী ঝড়ে কিন্তু একেবারে উল্‌টা—barometer কিছু না কিছু উঠ্‌বেই। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে কালবৈশাখী ঝড় যত প্রচণ্ড হবে barometerও তত বেশি উঠ্‌বে; এর কয়েকটি উদাহরণ পরে দিব। আসল কথা এই যে ঘূর্ণি-ঝড় আর কালবৈশাখী, এই দুয়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কালবৈশাখী ঝড় হবার আগে প্রায় দেখা যায় যে অনেকক্ষণ ধরে' "গুম্‌ট" করে রয়েছে, বাতাস খুব নরম, যেটুকু আছে তা প্রায়ই পূর্ব্ব দক্ষিণ দিক থেকে বইছে। কালবৈশাখী আসার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস হঠাৎ পশ্চিম বা উত্তর দিকে ঘুরে যায়, খুব জোরে ঝড় আরম্ভ হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে দম্‌কা হাওয়া দিতে থাকে। বারান্তরে আরও বিশদভাবে সব কথা বল্‌বার ইচ্ছা রইল।

বিবিধ

ফটোচিত্র ও জীববিজ্ঞান

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আজ কাল জীবতত্ত্বের আলোচনায় ফটোগ্রাফির সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক বিবেচিত হইতেছে। জীবজন্তুর আচার ব্যবহার, হাবভাব প্রভৃতি বুঝাইতে হইলে আলোকচিত্রের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তাহা সহজেই অনুমেয়। এই আলোকচিত্র গ্রহণ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। অনেক আয়াস স্বীকার করিয়াও সুযোগের অভাবে জীবজন্তুর স্বাভাবিক ফটো লইতে অনেকেই সমর্থ হন না। যাঁহারা প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে বন্য ও জলচর প্রাণীর ফটো লইতে পারিয়াছেন তাঁহারা বাস্তবিক বিজ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছেন। হয়'ত তাঁহাদের জীবনসংশয়ের সম্ভাবনা

ঝড়-বৃষ্টি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ

ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ এই তিন নিয়ে কালবৈশাখী—একথা পূর্ব্বেই বলেছি, এখন এসম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা যাক্।

ঝড় হচ্ছে বাতাসেরই নামান্তর—বাতাসের চাপ, বাতাস কি রকম ভাবে কোন দিক থেকে বইছে, আর বাতাসের গতি এর উপরেই ঝড়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

বাতাসের চাপ—সব রকম ঝড়ের খবরই আগে পৌঁছয় barometer যন্ত্রে; বাতাসের চাপ বদলাতে দেখে ঝড়ের সম্ভাবনা বোঝা যায়। কালবৈশাখী সম্বন্ধেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। কালবৈশাখীর সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের চাপ বদলাবার এমন একটা বিশেষ ধরন আছে যা' দেখে ঝড়টা কালবৈশাখী কি না তা' পরিষ্কার বোঝা যায়।

ঝড় আরম্ভ হবার কিছু ক্ষণ আগে থেকে বাতাসের চাপ খুব আস্তে আস্তে "পড়তে" সুরু করে। তবে বেশি ক্ষণ আগে নয়; কখনো কখনো দু তিন ঘণ্টা, কখনো আরো কম। আর এই "পড়তি"র পরিমাণও খুব সামান্য, অনেক সময় প্রায় ধরাই যায় না।

এই বছর (১৯২৪) কলিকাতায় ২৭শে এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টার একটু পরে একটা মাঝারি রকম কালবৈশাখী হয়ে যায়। তার ঘণ্টাখানেক আগে barometer পড়তে সুরু করে —এক ঘণ্টার মধ্যে সব শুদ্ধ প্রায় ০.০৬০" (0.060") ইঞ্চি (এক ইঞ্চির ১০০ ভাগের ৬ ভাগ) পড়ে *।

এই বছর (১৯২৪) ১৬ই এপ্রিল তারিখের ঝড়ের আগে বাতাসের চাপ প্রায় ৪ ঘণ্টা আগে কম্‌তে আরম্ভ করে; কিন্তু মোট কমেছিল সেই একই পরিমাণ 0.০৬০" ইঞ্চি। কিন্তু ১৩ই মে তারিখের ঝড়ের আগে barometer প্রায় কিছুই পড়ল না। আসল কথা কালবৈশাখী ঝড়ের আগে "পড়া"টা তেমন নিশ্চিত ব্যাপার নয়—তা' দেখে সব সময়ে পরিষ্কার কিছু বোঝা যায় না।

তা ছাড়া এই পড়ার পরিমাণও নিতান্ত সামান্য—প্রায় কখনো ০•১", এক ইঞ্চির দশ ভাগের একভাগও পড়ে না। ঘূর্ণি-ঝড়ের (cyclone) তুলনায় এই পড়া কিছুই নয়—বড় বড় ঘূর্ণি-ঝড়ে বাতাসের চাপ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক ইঞ্চির চেয়ে বেশী কমে গেল এমনও দেখা গেছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবরের ঘূর্ণি-ঝড়ে (cyclone) কলিকাতায় barometer ১.১৮" ইঞ্চি (অর্থাৎ প্রায় সওয়া ইঞ্চি) কমে গিয়েছিল।

বাতাসের চাপ সম্বন্ধে কিন্তু কালবৈশাখীর অন্য একটা নিজস্ব লক্ষণ আছে। ঠিক ঝড় আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা দু'চার মিনিট আগে বাতাসের চাপ খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে, আর barometer'ও তাড়াতাড়ি "উঠতে" সুরু করে। ২৭শে এপ্রিলের ঝড়ে দেড় ঘণ্টার মধ্যে barometer প্রায় ০•২৮০ ইঞ্চি (সিকি ইঞ্চির উপর) উঠে গিয়েছিল—এর মধ্যে আবার প্রথম ১০ মিনিট, আর মাঝে আর একবার প্রায় ১০ মিনিট ধরে' খুবই তাড়াতাড়ি বেড়েছিল, (ছবিতে এটা পরিষ্কার দেখা যাবে)। ১৬ই এপ্রিলের ঝড়ে এক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ০•১২০ ইঞ্চি উঠেছিল, আর ১৩মে তারিখে ০.১৫০ ইঞ্চিরও বেশি।

---

* বাতাসের চাপ মাপা হয় একটা একদিক বন্ধ নলের মধ্যে যত ইঞ্চি পারদ বাতাসের চাপে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তার উচ্চতা দিয়ে। সাধারণত বাতাসের চাপ প্রায় ৩০ ইঞ্চি উঁচু পারদকে ঠেলে রাখতে পারে। বাতাসের চাপ বাড়লে, পারদ-স্তম্ভের উচ্চতা বাড়ে, চাপ কমলে উচ্চতাও কমে। পারদ-স্তম্ভের উচ্চতা কমা বাড়া ইঞ্চি হিসাবে মাপা হয় বলে', বাতাসের চাপের কমা বাড়াও ইঞ্চি হিসাবেই ধরা হয়।

ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে এই barometer ওঠা, অর্থাৎ বাতাসের চাপ-বৃদ্ধি, কালবৈশাখীর একেবারে নিজস্ব লক্ষণ। ঘূর্ণি-ঝড়ে (cyclone) এরকম কখনো হতেই পারে না, ঘূর্ণি ঝড় যত ক্ষণ চল্‌বে barometerও ততক্ষণ নীচু থাকবে, ঝড় সরে' না যাওয়া পর্য্যন্ত barometer ওঠা অসম্ভব। কালবৈশাখীতে একেবারে উল্‌টা, ঝড় যতক্ষণ চলে barometer ততক্ষণ উঁচু থাকে, ঝড় চলে যাবার পরে barometer আবার নামতে আরম্ভ করে, তবে যে রকম তাড়াতাড়ি উঠেছিল তার চাইতে অনেক আস্তে; কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসে।

বাতাসের চাপের দিক দিয়ে তাহলে মোট কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে প্রথমে চাপ সামান্য একটু কমে' এসে হঠাৎ খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়, তার পর ঝড় চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। ২৭শে এপ্রিল তারিখে ঝড়ের যন্ত্র-লিপি দেখলেই কথাটা ঠিক বোঝা যাবে।

বাতাসের দিক-পরিবর্ত্তন—কালবৈশাখীর আর একটি লক্ষণ এই যে ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে বাতাস প্রায়ই দক্ষিণ-পূব থেকে উত্তর-পশ্চিমে ঘুরে যায়। ২৭শে এপ্রিল ৬টা বাজ্‌তে দশ মিনিট পর্য্যন্ত দক্ষিণে বাতাস দিচ্ছিল; ৬টার সময়ে একটু পশ্চিমে সরে' গেল—তার পর ৭টার অল্প পরেই যখন ঠিক ঝড় এল, বাতাস তখন হঠাৎ উত্তর পশ্চিমে ঘুরে' গেল। ঘণ্টাখানেক পরে যখন সব ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে বাতাস আবার আস্তে আস্তে দক্ষিণ-পূবে ফিরে এল। এই দিক-পরিবর্ত্তনটাও কালবৈশাখীর নিজস্ব প্রকৃতি; বাংলাদেশে ঘূর্ণি-ঝড়ে দিক-পরিবর্ত্তন এর ঠিক উল্‌টা রকমেই হয়ে থাকে। ঘূর্ণি-ঝড়ের আগে বাতাস সাধারণতঃ উত্তর দিক থেকে বইতে থাকে, তারপর ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণে ঘুরে যায়।

বাতাসের গতি—কালবৈশাখীর আগে প্রায়ই "গুমট্" করে আসে, বাতাস কমে যায়, কখনো কখনো একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ খুব জোরে ঝড় আরম্ভ হয়, সঙ্গে সঙ্গে দম্‌কা হাওয়া দিতে থাকে, শেষে আস্তে আস্তে আবার কমে গিয়ে সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসে। ২৭শে এপ্রিল তারিখে বেলা ৫৷৷০টা পর্য্যন্ত গরম হাওয়া চল্‌ছিল, বাতাসের গতি অনেকক্ষণ ধরে একই ভাবে ঘণ্টায় ১২ মাইল ছিল; ৫৷৷০টা থেকে বাতাসের গতি কম্‌তে আরম্ভ কর্‌ল, প্রথমে ৬ মাইল তারপর ৬টা থেকে ৬৷৷০টার মধ্যে ঘণ্টায় ৪ মাইলের চেয়েও কমে গেল। ৬৷৷০টা থেকে ৭টা পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে দম্‌কা হাওয়া দিতে লাগ্‌ল, তারপর ৭·১৫ (সওয়া সাতটার সময়) থেকে রীতিমত ঝড় আরম্ভ হ'ল, বাতাসের গতি তখন গড়ে ঘণ্টায় ৩২ মাইলেরও বেশি। তবে খুব অল্পক্ষণই এরকম চল্‌ল, আধ ঘণ্টা পরে আস্তে আস্তে বাতাস নরম হয়ে এল, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে, ৮-১৫ (সওয়া আটটা) থেকে আবার সেই পুরানো ঘণ্টায় ১২ মাইলে এসে নামল।

ছবিতে অবশ্য শুধু গড়পড়তা গতির কথাই দেওয়া হয়েছে। থেকে থেকে দম্‌কা হাওয়ার গতি যে ঘণ্টায় ৩২ মাইলের চেয়ে অনেক বেশি উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

কালবৈশাখী ঝড়ে বাতাসের গড়পড়তা গতি ঘণ্টায় ৫০।৬০ মাইল হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। কলিকাতায় একবার ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে দশ মিনিটের বেশি বাতাসের গতি ঘণ্টায় ৮২ মাইল হয়েছিল—এর চেয়ে বেশি গতি আলিপুরের যন্ত্র-চিত্রে কখনো লিপিবদ্ধ হয়নি।

বাতাসের উষ্ণতা (Temperature) কালবৈশাখীর আরএকটা লক্ষণ এই যে ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে বাতাস খুব তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এবছর (১৯২৪) ২৭শে এপ্রিল, ৭-৩০—৭-৪০, (সাড়ে সাতটা থেকে সাতটা-চল্লিশ মিনিট) এই দশ মিনিটের মধ্যে temperature ১০° (দশ ডিগ্রি) কমে গেল। ১৩মে তারিখে দশ মিনিটের মধ্যে ১৫° (পনর ডিগ্রি) ঠাণ্ডা হয়েছিল, আর ১৬ই এপ্রিল অল্প ক্ষণের মধ্যে প্রায় ২২° (বাইশ ডিগ্রি) গরম নেমে গিয়েছিল

বৃষ্টির জন্যই যে বাতাস ঠাণ্ডা হয়, তা' বলা যায় না; এমনকি মাটিতে এক ফোঁটা বৃষ্টি না পড়লেও বাতাস ঠাণ্ডা হবার কিছু কম্‌তি ঘটে না; এ বিষয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের "আঁধির" সঙ্গে কালবৈশাখীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ঘূর্ণিঝড়েও অনেক সময় বাতাস ঠাণ্ডা হয় বটে, কিন্তু কালবৈশাখীর মত এত বেশি আর এত তাড়াতাড়ি নয়, তাছাড়া ঘূর্ণি-ঝড়ে যে সব সময়ে ঠাণ্ডা হবেই তাও বলা যায় না, কিন্তু কালবৈশাখী সম্বন্ধে এক রকম নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে বাতাস কিছু না কিছু ঠাণ্ডা হবেই।

কালবৈশাখী বৃষ্টি ও বজ্রপাত—কালবৈশাখীর সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই বেশ খানিকটা বৃষ্টি হয়ে যায়। প্রথম দম্‌কা হাওয়াটা একটু কমে' এলে তারপর বৃষ্টি আরম্ভ হয়। বৃষ্টির ফোঁটা-গুলি খুব বড় বড় হয়—আর অনেক সময় বৃষ্টি খুব জোরেই আসে। তবে বাতাস খুব বেশি গরম থাকলে সময় সময় সমস্ত বৃষ্টি মাটিতে এসে পৌছায় না—পৌছাবার আগেই বাতাসের তাপে আবার উড়ে গিয়ে বাষ্প হয়ে যায় তাই কখনো কখনো মনে হয় যে বৃষ্টি প্রায় হ'লই না, কিন্তু তখনও আসলে আকাশে বৃষ্টি হয়ে যায়। মাটিতেই হোক্ আর আকাশেই হোক্‌বৃষ্টি ছাড়া কালবৈশাখী প্রায় ঘটতেই পারে না।

কালবৈশাখীর বৃষ্টি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না; ঝড় চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। এবছর ২৭শে এপ্রিল তারিখে মাত্র ২৫ মিনিট বৃষ্টি পড়েছিল কিন্তু বৃষ্টির পরিমাণ খুব সামান্য নয়, ০.২০ ইঞ্চি *। ১৩ই মে তারিখে আধ ঘণ্টায় প্রায় আধ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ৯ই এপ্রিল কুড়ি মিনিটের মধ্যে দেড় ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছিল।

কালবৈশাখী বৃষ্টির সঙ্গে প্রচুর বজ্রপাত হতে দেখা যায়। এটাও কালবৈশাখীর একটা বিশেষ লক্ষণ। এমন বিদ্যুৎ আর এত বজ্রপাত বর্ষার মেঘে বা ঘূর্ণি-ঝড়ের সঙ্গে কখনো

* ৫ ইঞ্চি ব্যাসের গোল মুখ-ওয়ালা পাত্রে বৃষ্টির জল ধরা হয়; এই জল নির্দ্দিষ্ট পরিমাপের measure-glassএ ঢেলে' যত ইঞ্চি দাঁড়ায় বৃষ্টির পরিমাণও তত ইঞ্চি বলা হয়। কলিকাতায় প্রতি বছর গড়পড়তা ৬২ (বাষট্টি) ইঞ্চি বৃষ্টি হয়; বর্ষাকালে এক এক মাসে ১৫।১৬ (পনেরো ষোল) ইঞ্চি বৃষ্টি হয়ে থাকে। সময়ে সময়ে এক দিনের মধ্যে তিন ইঞ্চি বৃষ্টিও হয়ে যায়। সাধারণতঃ একদিনে ১ এক ইঞ্চি বৃষ্টিকে লোকে বেশ রীতিমত বৃষ্টি ব'লে থাকে; এই থেকে এক ইঞ্চি বৃষ্টির কতকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

দেখা যায় না। বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে এই বিদ্যুতের খুব নিকট সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে সাধারণ লোকের মনে কিছু কিছু ভুল ধারণা দেখা যায়। অনেকে মনে করেন যে বজ্রপাতই বুঝি বৃষ্টি হবার কারণ। এই রকম ধারণা হওয়া আশ্চর্য্য নয়, কারণ অনেক সময়েই বাজ-পড়ার অল্প পরে বৃষ্টি দেখা দেয়। কিন্তু আসলে বৃষ্টি ও বজ্রপাত একই সঙ্গে হয়—তবে, প্রথমেই বিদ্যুৎ চম্‌কানো চোখে পড়ে, তার পর বাজ-পড়ার শব্দ পৌঁছয়, সব শেষে বৃষ্টি আসে। তার কারণ এই যে, আলোকের রশ্মি শব্দের চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি যায়, আবার শব্দও বৃষ্টির চাইতে ঢের বেশি আগে পৌঁছায়; তাই বিদ্যুতের চক্‌মকি, বাজ-পড়া আর বৃষ্টি এক সঙ্গে হলেও একটার পর অল্প আর একটার খবর আসে। কালবৈশাখীর জন্মকথা আসচে বারে আলোচনা করবার সময় বোঝা যাবে যে কালবৈশাখীতে বজ্রপাত এত বেশি হয় কেন।

দক্ষিণ বাংলায় চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে যে বৃষ্টি হয় তার প্রায় সমস্তটাই কালবৈশাখীর সঙ্গে। কোন কোন বছর এই সময় এক একটা ঘূর্ণি-ঝড়ও আসে, আর তা'তে খানিকটা বৃষ্টিও হয়, কিন্তু এর পরিমাণ অতি সামান্য। গত ১০ বছরের মধ্যে মার্চ্চ মাসে মাত্র একটি ঘূর্ণি-ঝড় হয়েছে, এপ্রিল মাসে একটি ও মে মাসে তিনটি। গত ১০ বৎসরের বিবরণী থেকে দেখতে পাই যে মার্চ্চ মাসে প্রতি বছর গড়পড়তা সওয়া ইঞ্চি বৃষ্টির মধ্যে প্রায় সমস্তটাই হয়েছিল কালবৈশাখীর সঙ্গে; এপ্রিল মাসে দুই ইঞ্চির একটু বেশী—তাও সব কালবৈশাখীর ঝড়ে; মে মাসে গড়পড়তা প্রায় পাঁচ ইঞ্চির মধ্যে মাত্র সওয়া ইঞ্চি হয় ঘূর্ণি-ঝড় থেকে। জুন মাসের প্রথম ভাগে কিন্তু ঘূর্ণি-ঝড় থেকে গড়ে প্রতিবসর চার ইঞ্চির উপর বৃষ্টি হয়, আর কালবৈশাখী থেকে মাত্র দেড় ইঞ্চি। নীচের তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে।